করব।

1.3.2. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) বা, উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method)

কোন একটি দেশে এক বছরে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাকার্য্য উৎপন্ন হয় তাদের অর্থমূল্য যোগ করলে এবং একই দ্রব্যকে একাধিক বার গণনা পরিহার করলে ঐ যোগফলকে স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা সংক্ষেপে G.N.P.) বলে। এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয় ক্ষতি বা অবচিতি বা অবচয় (Depreciation) বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product)। এই নিট জাতীয় উৎপাদনই জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন এক বছর) দেশে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়। তাদের এককও বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সরাসরি যোগ করা সম্ভব নয়। সেজন্য উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীকে তাদের দাম দিয়ে গুণ করে তাদের অর্থমূল্য নির্ণয় করে যোগ করা হয়।

উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হয় যেন একই দ্রব্যের মূল্য একাধিক বার ধরা (multiple counting) না হয়। যদি এক বছরের মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর ও সেবাকার্যের মূল্য যোগ করা হয় তাহলে একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার যোগ করা হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এক বছরের মধ্যে উৎপন্ন গমের একটা অংশ ঐ বছরই ময়দায় পরিণত করা হয় ময়দার কলে। আবার ঐ বছরই ঐ ময়দা থেকে পাউরুটি তৈরি করা হয়। এখন যদি গমের মূল্য, ময়দার মূল্য এবং পাউরুটির মূল্য যোগ করা হয় তাহলে গমের উৎপাদনের যে অংশটুকু ময়দা উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পরে পাউরুটির উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই অংশটুকুর মূল্য তিনবার ধরা হচ্ছে কারণ ময়দার মূল্যের মধ্যেই গমের মূল্য রয়েছে। আবার পাউরুটির মূল্যের মধ্যে রয়েছে ময়দার মূল্য যাতে আবার রয়েছে গমের মূল্য। কাজেই গমের মূল্য, ময়দার মূল্য এবং পাউরুটির মূল্য তিনটিই ধরলে পাঁউরুটি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত গমের মূল্য তিনবার ধরা হয়ে যাচ্ছে। একই দ্রব্যের মূল্য এই ধরনের একাধিকবার গণনা পরিহার করতে হবে।

একাধিকবার গণনা পরিহার করার জন্য দুটি উপায় আছে। একটিকে বলে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি (Final Product Method) ; অন্যটিকে বলে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method)।

➤ শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি (Final Product Method) : এই পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি—শেষ উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্তর্বর্তী দ্রব্য (Intermediate goods)। যদি কোন দ্রব্য যে বছর উৎপন্ন হচ্ছে সেই বছরেই অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হয় এবং নিঃশেষ হয়ে যায় তবে তাকে বলা হবে অন্তর্বর্তী দ্রব্য। যে দ্রব্যটি অন্তর্বর্তী দ্রব্য নয় এই হিসাব অনুযায়ী সেটিই শেষ উৎপন্ন দ্রব্য। মনে রাখতে হবে এই শ্রেণিবিভাগ দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী। একই দ্রব্য একই সময়ে অন্তর্বর্তী দ্রব্য এবং শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন কোন বছরে উৎপন্ন কয়লার যে অংশটুকু ইস্পাত চুল্লীতে জ্বালানি আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অংশটুকু অন্তর্বর্তী দ্রব্য। কিন্তু কয়লার যে অংশটুকু বাড়িতে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অংশটুকু শেষ উৎপন্ন দ্রব্য।

উৎপাদন শুমারি পদ্ধতিতে যদি শেষ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যটুকুই ধরা হয় এবং যদি অন্তর্বর্তী উৎপাদনের মূল্য না ধরা হয় তাহলে একাধিকবার গণনা পরিহার করা যাবে। আমাদের আগের উদাহরণে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে পাউরুটির মূল্য শুধু ধরা হবে। গমের মূল্য বা ময়দার মূল্য ধরা হবে না। এইভাবে গমের মূল্য একাধিকবার গণনার সমস্যাটি এড়ানো যাবে।

▶ মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) : আর একরকম উপায়ে একাধিকবার গণনার সমস্যাটি পরিহার করা যেতে পারে। সেটি হল উৎপাদনের প্রতি স্তরে কতটা মূল্য সংযোজন হচ্ছে তা নির্ণয় করা এবং যোগ করা। কোন উৎপাদন পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত নিঃশেষিত এবং সেই বছরেই উৎপাদিত কাঁচামালের মূল্যের বিয়োগফল (Value added is the difference between the total value of output of the year and the value of all raw materials that have been drawn from the production of the year and have been used up)। যে কাঁচামাল বর্তমান বছরের উৎপাদন থেকে আসেনি বা যে কাঁচামাল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না তাদের মূল্য বাদ হবে না মূল্য সংযোজন নির্ণয় করার জন্য। এক বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত উৎপাদনী ইউনিটগুলিতে মোট কত মূল্য-সংযোজন ঘটছে তার যোগফল থেকেও আমরা স্থূল জাতীয় উৎপাদন পেতে পারি।

শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতি থেকে আমরা একই ফল পেতে পারি। বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করা যাক কোন বছরে 1000 টাকার গম উৎপন্ন হয়েছে। তার সবটাই ময়দা কলে ময়দায় পরিণত করা হয়েছে ঐ একই বছরে। ঐ ময়দার মূল্য ধরা হ'ল 1500 টাকা। আবার ধরা যাক ঐ ময়দার সবটাই ঐ একই বছরে পাঁউরুটির উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছে এবং ধরা যাক পাঁউরুটির মূল্য 2500 টাকা। এখন শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতিতে আমরা শুধু পাঁউরুটির মূল্যকেই ধরব। স্থূল জাতীয় উৎপাদন তাহলে হবে 2500 টাকা। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে বিচার করলে গম উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে 1000 টাকা। ময়দা উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে (1500 – 1000) বা 500 টাকা। পাঁউরুটির উৎপাদনে মূল্য সংযোজিত হচ্ছে (2500 – 1500) বা 1000 টাকা। তাহলে মোট মূল্য সংযোজন (1000 + 500 + 1000) বা 2500 টাকা যা পাঁউরুটির মূল্যের সঙ্গে সমান। কাজেই শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে আমরা একই ফল পাই।

যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে এই মূল্য সংযোজন পদ্ধতি প্রয়োগ করা খুবই সহজ। কোম্পানি আইনের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি যৌথ মূলধনি কোম্পানিকে আয় ব্যয়ের হিসাব বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হয় এবং বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বাধ্যতামূলকভাবে শেয়ার হোল্ডারদের বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করতে হয়। এই আয় ব্যয়ের হিসাবে কোম্পানি বছরের মধ্যে কোন্ কোন্ খাতে কত ব্যয় করছে তারও উল্লেখ থাকে। কোম্পানির ব্যয়ের দুটো অংশ থাকে। একটা অংশ কোম্পানির সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য ব্যয়। এটাকে অবচিতি বা ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় বলা যেতে পারে। কোম্পানির প্রাপ্তিগুলির সমষ্টি থেকে এই অবচিতি বিয়োগ দিলে যা থাকে তাই ঐ কোম্পানির মূল্য সংযোজন। এই সংযোজিত মূল্য থেকেই কোম্পানি মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি বিলি করে। এইগুলিই যৌথ মূলধনি কোম্পানির ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশ। কাজেই কোম্পানির হিসাবপত্রের খাতা থেকে সহজেই মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে। এইভাবে সমস্ত যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূল্য সংযোজন যোগ করলেই যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলিতে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যাবে।

শুধু যৌথ মূলধনি কোম্পানিই নয়, এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠানেও এই ধরনের আয় ব্যয়ের হিসাব অনেক ক্ষেত্রেই রাখা হয়। যে সব ক্ষেত্রে এই ধরনের হিসাব রাখা হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানের মূল্যসৃজনও এইসব হিসাব থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে এখানে অনেক সহজে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। যেমন ধরা যাক কোন কোম্পানিতে 1,000 শ্রমিক নিযুক্ত আছে এবং ঐ কোম্পানির ধরা যাক 10,000 শেয়ার হোল্ডার আছে। আয় শুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী এই 1,000 শ্রমিক

এবং 10,000 শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে আয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু যৌথ মূলধনি কোম্পানির মূল্যসৃজন থেকেই এই হিসাব আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সমস্ত শ্রমিক বা সমস্ত শেয়ার হোল্ডারের কাছে আমাদের যেতে হচ্ছে না। এইভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবের খাতাপত্র থেকেই পেতে পারি।

এইবার সরকারি ক্ষেত্রে কাজকর্মের ফলে জাতীয় আয় কতটা সৃষ্টি হয় তা দেখা যাক। সরকারের কর্মচারীরা সরকারকে সেবাকার্য বিক্রি করে এবং তার ফলে তারা সরকারের কাছ থেকে বেতন পায়। এই বেতনকে সরকারের কাজকর্মের মূল্য (Value of Public Services) হিসাবে ধরা যেতে পারে। সরকারি কাজকর্মকে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য না অন্তর্বর্তী উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ধরা হবে এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে স্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী সরকারি কাজকর্মকে আমরা শেষ স্তরের দ্রব্য হিসাবেই ধরব। সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ণের আর একটি দিক আছে। অনেক সরকারি সেবাকার্য বাজারে বিক্রি হয় না। এদের কোন বাজার দাম নেই। কাজেই এই ধরনের সেবাকার্য যোগান দেওয়ার জন্য সরকারের যা ব্যয় সেটাকেই সরকারের সেবাকার্যের মূল্য হিসাবে ধরতে পারি। সরকারের হিসাবপত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে কতটা জাতীয় আয় উদ্ভূত হচ্ছে তাও সহজে জানা যেতে পারে।

এছাড়া অর্থনীতিতে রয়েছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বা স্বনিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন স্বাধীন ওকালতিতে নিযুক্ত উকিল, স্বাধীন প্র্যাকটিশে রত ডাক্তার, স্বাধীন প্র্যাকটিশে রত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি। এঁরা যত আয় করছেন সেটা এঁদের সেবার মূল্য হিসাবে ধরা যেতে পারে। এঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য আয় পদ্ধতি গ্রহণ করাই সহজ।